'বঙ্গভাষা': মধুসূদন দত্ত

'বঙ্গভাষা' সনেটটি আত্মস্মৃতিমূলক। বঙ্গভাষা নিয়ে মধুসূদন আগে যা বলতে পারেন নি, তা এখানে অকপটে স্বীকার করেছেন। এখানে মাতৃভাষাকে এড়িয়ে বিপথে যাওয়ার জন্য কবির আক্ষেপ, অনুশোচনা, খেদ এবং শেষে যথার্থ পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য নিজের মানসিক প্রাপ্তি এবং আনন্দ। কবিতাটি মধুসূদনের জীবন-কথায় অভিষিক্ত বলে খুবই জীবন্ত। এবং আমাদের মনে কবির জন্য সহানুভূতি জাগায়।

কবিতাটির সূচনায় কবি যাঁকে সম্বোধন করেছেন, তিনি হলেন 'বঙ্গভাষা'। মধুসূদন তাঁর কিশোর ও প্রথম যৌবনে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষার একজন বড় কবি হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। সেই সময় ইংরেজি কবি বায়রন ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। এছাড়া স্কট ও কবি মুর তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করত ও উদ্বুদ্ধ করত। ফলত প্রথম যৌবনে তিনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গেই ইংরেজি ভাষার চর্চা শুরু করেছিলেন। আরো পরে প্রগাঢ় উৎসাহে মাদ্রাজ প্রবাসকালে লিখেছিলেন 'ক্যাপটিভ লেডি' এবং 'ভিসনস অব দি পাস্ট'। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ গ্রন্থ দুটি রচনা করে মধুসূদন তাঁর কাঙ্ক্ষিত যশ বা খ্যাতি পাননি। এর পর কলিকাতা প্রত্যাবর্তন এবং কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনার পর তাঁর লেখা-জোখা সাহিত্য

তাঁকে আত্ম অত কাঙ্ক্ষিত পথটি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। 'অবরেণ্য' ইংরেজি ভাষা ছেড়ে তিনি শেষপর্যন্ত 'বরেণ্য' মাতৃভাষাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিলেন।

তৎকালীন বাংলা সাহিত্য এবং মধুসূদনের জীবনে পরিবর্তিত এই ঘটনাগুলিকে কবি কখনো ভুলতে পারেননি। আত্মস্মৃতির মাধ্যমে কবি এখানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা – 'বঙ্গভাষাকে' সম্বোধন করে কবি মধুসূদন এই অকপটে নিজের ভুল ভ্রান্তির কথাগুলিকে কবুল করেছেন। বাংলাই ভাষার ভান্ডার বরাবরই ছিল বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ, ছিল সমৃদ্ধ। কবি মাতৃভাষার এই রত্নসম্ভারকে অবহেলা করে পরধন লোভে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে চর্চা করে চলেছিলেন তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। বাংলাদেশ ছেড়ে যখন 'পরদেশ' মাদ্রাজে প্রবাসে জীবন-যাপন করছিলেন যেখানেও এই ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এই বিপরীত আচরণের জন্য তাঁর জীবন থেকে চলে গিয়েছিল সুখ, চলে গিয়েছিল আনন্দ। অনিদ্রা আর অনাহার হয়েছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর দেহ ও মন হয়েছিল জর্জরিত। যা অবরেণ্য তাকে বরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তাঁর আশা। কমল কাননের ঐশ্বর্য ভুলে তিনি কোনদিন মেতে উঠেছিলেন 'শৈবাল' বা 'শেওলা' বনের মোহ মেলায়।

তবে এই বিপরীত খেলা বেশিদিন চলেনি। অকস্মাৎ হঠাৎ পরিবর্তন হল। মধুসূদনের কুললক্ষ্মী যেন হঠাৎ করে একদিন কবিকে স্বপ্নে সতর্ক ও সচেতন করে দিয়ে বললেন –

"ওরে বৎস! যার মায়ের ভাণ্ডার নানা রতনরাজিতে পূর্ণ, তার ছেলে এমনতর ভিখারির দশা? যাই তুই নিতান্তই অবোধ ও অজ্ঞান, এখনই নিজের ঘরে ফিরে যা।"

মধুসূদনের কুললক্ষ্মীর কাছে এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবির মোহভঙ্গ হল। তিনি বুঝলেন পরের ভাষা ইংরেজি যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, সে একান্তভাবে পরেরই। সে ভাষা ভিক্ষা করে নিজের করে নেওয়া আদৌ সম্ভব হয় না। নিজের প্রতিভার যথার্থ বিকাশ কেবলমাত্র নিজের মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুতে সম্ভব নয়। সুতরাং স্বপ্নের আদেশ কবি নির্দ্বিধায় পালন করলেন। এই নির্দেশ পালনের ফলে যথাসময়ে কবি মণি-মাণিক্য সমৃদ্ধ ও সম্পদের খনি মাতৃভাষার সন্ধান পেয়ে গেলেন।

দেশ দেখাচ্ছে অন্ধকারে : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'দেশ দেখচ্ছে অন্ধকারে' কবিতাটি "কলকাতার যীশু" কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতাটিতে সত্তর দশকের অস্থির রাজনীতি হেতু সারা বাংলা তথা বাঙালির জনজীবনে যে অন্ধকার সময় ঘনীভূত হয়েছিল তারই প্রতিফলনস্বরূপ কবি-হৃদয়ে যে ক্ষোভ ও অভিমান জমা হয়েছিল তারই প্রতিফলনে রচিত হয়েছে এই কবিতাটি। ক্ষোভ-অভিমানের সঙ্গে মিলেমিশে ব্যঙ্গও হয়ে উঠেছে। কবি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন। তাই স্বাভাবিক কারণে বাংলাদেশের প্রতি কবির ছিল আত্মিকবন্ধন। সত্তর দশকের সূচনায় যে অস্থিরতা, যুদ্ধ দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশকে ঘিরে, সে বাংলাদেশকে ঘিরে বাঙালি জীবনে এক আবেগের ঢল নেমেছিল। সেই বাংলাদেশকে কিন্তু নতুন করে চেনার তাগিদ কবির মধ্যে ছিল না। কেননা, বাংলাদেশ তাঁর কাছে ছিল করতলগত। হিংসা, হত্যায় জর্জরিত বাংলাদেশকে তিনি তাঁর জন্মসূত্রে অন্তরের টানে ও ভালোবাসায় সহজেই চিনে নিতে পারেন। কাজেই, কোনো গুরুমশাইয়ের নির্দেশের তাঁর প্রয়োজন নেই। তাঁর স্মৃতির মধ্যে যে বাংলাদেশ তার খোলামেলা সুন্দর প্রকৃতি নিয়ে বিরাজ করছে জনমানুষের আনন্দ-সুখ-আহ্লাদ তা যেমন কেউ কখনও মুছে দিতে পারে না, তেমনি পারে না ভাগ করতে। কাজেই দেশ দেখানোর নামে কোনো বানানো গল্পে তাই তার আস্থা নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নকশাল আন্দোলনে কবির অন্তর উদ্বেলিত হওয়ার জন্যই দেশকে কেন জানি তাঁর নতুন করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য তিনি কারুর সাহায্য চান না। কাজেই, স্কুলপড়ুয়াদের মতন কোনো মানচিত্রের হদিশ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁর জন্মভূমি আপন স্বদেশ তাঁর অন্তরে স্মৃতির আলোয় উদ্ভাসিত। কবিতাটির সারসত্য এটিই।

মাত্র দুটি স্তবকে কবিতাটি 'দেশ দেখাচ্ছে অন্ধকারে'। কবিতাটিতে নাটকীয়তা আছে। দুটি চরিত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। একজন 'গুরুমশাই,' অন্যজন কবি নিজে। কবিতায় বর্ণিত গুরুমশাই দেশ দেখাচ্ছেন, আর কবি তার দেশ দেখার অনুভবের কথা বলছেন। সাধারণত দেশ বলতে মানচিত্রের কথা মনে পড়ে। তারপর আসে মাটি, পাহাড়, সমুদ্র, নদী, অরণ্য এসবের বিবরণ। দেশ শুধু এসব নয়—এরও উর্ধ্বে। দেশ বলতে বোঝায় জননী জন্মভূমি। কথায় আছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী'। কাজেই কবির কাছে ভূগোলের বই খুলে গুরুমশাইয়ের দেশ দেখানোতে তীব্র আপত্তি। কবিতাটির শুরুতে কবি যখন বলেন—

> এই যে নদী, ওই অরণ্য, ওইটে পাহাড়,
> এবং ওইটে মরভূমি।

Scanned with CamScanner

আমরা পেয়ে যাই গুরুমশাইকে। তিনি একখানি বেশ উঁচিয়ে টাঙানো মানচিত্র দেখাচ্ছেন—নদী, অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি।

এইভাবে কবিকে দেশ দেখানোতে কবি খুশি নন। গুরুমশাইয়ের মানচিত্র দেখিয়ে দেশ দেখানোর মধ্যে কবি খুঁজে পান 'নতুন খেলা'। কিন্তু কবির তা বাঞ্ছিত নয়, তাই তিনি স্পষ্টই বলেন—

শহর-গঞ্জ-খেত-খামারে
ঘুমিয়ে আছে দেশটা যখন, রাত্রিবেলা
খুলছে মানচিত্রখানি।

শহর-গঞ্জ-খেত-খামারে কাজ করা মানুষেরা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে, তখন দেশ দেখানোর অর্থ কবির কাছে একটা চালাকি ছাড়া কিছু নয়। কেননা, কবি অনুভব করেন—মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। এমনকি, নদী, অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি, ধান-চা-কার্পাস-তুলো-কফি-তামাকের বাগানের অবস্থান মানচিত্র দেখে চিনে নিলেই প্রকৃত দেশ চেনা হয় না। দেশকে সত্যস্বরূপের উপলব্ধি ব্যতীত কবি চিনতেও চান না। গুরুমশাইয়ের 'দম-লাগানো কলের মতন' বলা হাজার কথা তাই কবি গুরুত্ব দেন না। প্রাবন্ধিক তরুণ মুখোপাধ্যায় 'সত্যিই কি এতে দেশ দেখা বা দেখানো হচ্ছে?' এই প্রশ্ন তুলে এই কবিতাটির আলোচনাকালে ক-টি সুন্দর কথা বলেছেন, যা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—বারংবার 'অন্ধকার' শব্দে কবি জোর দিয়েছেন। কেননা, তিনি অন্ধকার চান না; তাঁর সৃষ্ট বা দেখা অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। তিনিও চান। যারা সুযোগ বুঝে অন্ধকার তৈরি করে, ফিকির খোঁজে, তাদের দলে তিনি নাম লেখান নি। তাই অযথা রহস্য, কুয়াশা, হেঁয়ালি কিংবা ছলনার অন্ধকারে স্বদেশকে তিনি দেখতে চান না। অথবা তাঁর দেশকে যাঁরা হত্যা, খুন ঈর্ষায় তমসাচ্ছন্ন করেছে, সেই দেশও চান না। 'গুরুমশাই' কোনো শিক্ষককে নয়, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল যারা, তাদের ব্যঙ্গ করেছেন। অহেতুক পণ্ডিতি দেখিয়ে, ভুল বুঝিয়ে যারা গুরুগিরি করে, তাদের কবি বিদ্রূপ করেছেন। প্রকৃত স্বদেশ-আত্মাকে না-জেনে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। দেশের কথা স্মৃতির আকারও। সেকথা ভুলে গিয়ে ভূগোল পাঠ করা নিরর্থক। তা অন্ধের হস্তিদর্শন মাত্র। ফলে প্রথম স্তবকের শেষে কবির ব্যঙ্গ ও পরিহাস—'গুরুমশাই/অন্ধকারের মধ্যে তুমি দেশ দেখাচ্ছ'। (একালের কবিতা : পাঠকের দর্পণে)। তরুণবাবুর কথাগুলি যে কতটা অর্থবহ তা বোঝা যায় পরের স্তবকে কবির অভিব্যক্তিতে—

কিন্তু আমরা দেশ দেখি না অন্ধকারে।
নৈশ বিদ্যালয়ের থেকে চুপি-চুপি
পালিয়ে আসি জলের ধারে।

নিজ বিশ্বাসে অটল থাকতে চান কবি। গুরুমশাইয়ের দেখানো দেশ-এর প্রতি তাই তিনি বিভ্রান্ত হন না। নিজ বিশ্বাসে অটল থাকার জন্যই কবি স্মৃতিতাড়িত হয়ে 'আমরা দেশ দেখি না অন্ধকারে' একথা বলে নৈশ বিদ্যালয়ের গণ্ডি টপকে জলের ধারে পালিয়ে আসার কথা বলেন। নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয় বয়স্ক শিক্ষার এবং নিরক্ষরদের সাক্ষর করার জন্য।

Scanned with CamScanner

কবি দেশকে সুগভীর ভাবে ভালোবাসেন বলেই দেশকে না-বোঝাটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বলে মনে হয়। কবি যে দেশকে জানেন, বোঝেন তা কোনো গুরুমশাইয়ের বিদ্যালয়ে পড়ানো বইয়ের পাতার ধারাবিবরণীতে নেই। তা ছড়িয়ে আছে মায়াবী প্রকৃতির রম্যতার সৌন্দর্যের ভেতরে। কবির কথাতেই যা স্পষ্ট—

ঘাসের পরে চিত হয়ে শুই, আকাশে নক্ষত্র গুনি,
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের টানা শব্দ শুনি।
মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যায় টুক্‌রো টুক্‌রো হাজার ছবি;
উঠোন জুড়ে আল্পনা, আল-পথের পাশে
হিজল গাছে সবুজ গোটা,
পুণ্যি-পুকুর, মাঘমণ্ডল, টিনের চালে হিমের ফোঁটা।

দেশ ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে প্রকৃতির অমল সুধাময়তার রম্যতার। প্রকৃতির কাছে পালিয়ে এসে সবুজ ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আকাশের নক্ষত্রের মধ্যে বিভোরতায় খুঁজে পেয়েছেন দেশ-জননীর প্রকৃত আনন্দানুভূতি যা কবিকে স্মৃতিকাতরতায় মথিত করে কবির মাথার ভেতরে ঢেউ তুলেছে টুক্‌রো টুক্‌রো হাজার ছবির। কবি হয়ে পড়েছেন কবি জীবনানন্দ দাশের মতন রূপসী বাংলার মতন স্বদেশজননীর প্রেমে নস্টালজিয়া। তাই হাজার টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি স্মৃতিবেদনার আনন্দমেলা হয়ে কবিকে করে ফেলে বিভোরতায় আচ্ছন্ন। উঠোন জুড়ে আল্পনা, আল-পথের পাশে হিজল গাছে সবুজ গোটা, পুণ্যি-পুকুর, মাঘমণ্ডল, টিনের চালে হিমের ফোঁটা—এসব মুগ্ধতার ছবি কবির স্মৃতিতে যতই জ্বল জ্বল করে ততই দেশজননী তাঁর হৃদয়ে এক আনন্দকরোজ্জ্বল প্রাণের উত্তাপ এনে দেয়, এনে দেয় এক আলোকিত দেশের প্রতিচ্ছবি। গুরুমশাইয়ের দেখানো মানচিত্রের দেশ তাঁর কাছে তাই হয়ে পড়ে নিরর্থক।

বলতে গেলে বাংলার রম্য-প্রকৃতির মধ্যে বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত কবি যেন খুঁজে পান স্মৃতিরোমন্থনে তাঁর রূপসী বাংলা, তথা স্বদেশজননীকে। ভূগোলের অন্ধকারের পাতা থেকে যেন কবি খুঁটে আনেন তাঁর স্মৃতিতে ধরা প্রাণবন্ত বাংলার স্বদেশ জননীকে। বলতে কুণ্ঠা নেই, জীবনানন্দীয় ঢঙেই কবি নীরেন্দ্রনাথ স্মৃতিকাতরতার ভেতর দিয়ে তাঁর বাংলাদেশ, তথা স্বদেশ জননীর প্রেমে উদ্‌গাতা হয়ে অনুভব করেন বাতাসে ফুলের গন্ধ। শিউলি ফুলের গন্ধ—যা শরতের, যার মধ্যে ধরা পড়ে কৈশোরের নির্মলতার ছবি। অর্থাৎ ছেলেবেলায় কবি যে শিউলিফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ অনুভব করেছিলেন তার স্মৃতি আজও অক্ষয় রয়েছে। পারেনি দেশভাগের-দাঙ্গার অন্ধকার ম্লান করতে। কবি অনুভব করেন তাই ‘এ আঁধারেও ফুলের দারুণ সমারোহ’। অর্থাৎ কবির কাছে গুরুমশাইয়ের দেশ দেখানো অন্ধকার একমাত্র সত্য নয়। ফুল হল সৌন্দর্যের সেই প্রতীক—যে সৌন্দর্যের মধ্যে ধরা রয়েছে প্রকৃত প্রেমানন্দের এক উজ্জীবনী-আলো। বলতে গেলে কবির দেশ অন্ধকারে ঢাকা নয়, কবির দেশ ‘স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে; স্মৃতি দিয়ে ঘেরা’। কবির দেশ যেমন স্মৃতির স্বপ্নে ভরা, তেমনি ভরা আনন্দ-ভালোবাসায়। কাজেই, গুরুমশাইয়ের দেখানো মানচিত্র পাটে নয়, কবিকে যদি চিনতেই হয়, তিনি তাঁর স্বদেশকে চিনে নেবেন ভালোবাসার

Scanned with CamScanner

অমোঘ স্মৃতিকাঞ্চনে। কবিতাটির শেষে কবি-ভাষণে যা স্পষ্ট বলেছেন কবি—

অন্ধকারে কে দেখাবে মানচিত্রখানা
মাথার মধ্যে দৃশ্য নানা,
স্মৃতির মধ্যে অজস্র ফুল,
তার সুবাসেই দেখতে পাচ্ছি বুকের মধ্যে।

স্বদেশ কবির কাছে হয়ে ওঠে স্মৃতিজারিত এক ভালোবাসার আলোর ঠিকানা।

Scanned with CamScanner

আমার ভালোবাসা : শামসুর রাহমান

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের তাৎপর্যপূর্ণ কবি শামসুর রাহমান। কবিজীবনের প্রথম পর্বে বিশুদ্ধবাদী কাব্যচর্চায় মগ্ন হয়েও কবি সময়-সমাজ-সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি নান্দনিক সৌন্দর্য চেতনায় মত্ত হয়েও অসুন্দর আর 'কবরের কাঁচা মাটিতে' ভালোবাসাকে খুঁজে ফিরেছেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিকালীন বুলেট বিধ্বস্ত বাংলাদেশে নিজভূমে পরবাসী ছিলেন কবি শামসুর রাহমান। ওপার বাংলার স্বাধীনতা পরবর্তী 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' দাঁড়িয়ে কবি শুরু করেছিলেন তাঁর কাব্যকথা, পূর্ববাংলায় অস্থির পরিবেশ কবিকে আত্মসমীক্ষা, আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ক্রমশ জাগ্রত চেতনার অধিকারী করে তুলেছে, যা তাঁর কবিতায় তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা সংযোজন করেছে।

কবিজীবনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শে আদর্শবান ছিলেন কবি। অন্যদিকে জীবনানন্দের কবিতাও কবিকে নাড়া দিয়েছিল। আসলে পঞ্চাশের কাব্যজগতে আমরা যখন প্রবেশ করছি তখন কবিতা ক্রমশ উত্তরাধিকারকে অস্বীকার না করেও নিজের আলাদা একটা বিশ্ব তৈরি করে নিতে চাইছে। কবিতা পরিণত হচ্ছে—

> "কবির ব্যক্তিগত কথনের মাধ্যম, স্বীকারোক্তি প্রদানের নিভৃত উচ্চারণ এবং আত্মসংশ্লেষ তথা আত্মসমীক্ষামূলক জীবনচৈতন্যের অবলম্বন।"[১]

এই 'আত্মসমীক্ষামূলক জীবনচৈতন্যকে' সঙ্গী করেই কবির সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সূচনা। এরপর ক্রমাগত দেশভাগ, বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কবি শামসুর রাহমানের কাব্যকোলাজে রক্তিম মাত্রা সংযোজিত করে। কবিচেতনায় অন্তর্মুখীনতার নিঃসঙ্গ প্রভাব যেমন স্পষ্ট তেমনি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত হয় বহির্বিশ্বের চেতনাও। এমনই এক কালপর্ব থেকে উঠে আসেন এই কালপুরুষ।

কবি শামসুরের কাব্যজীবনে সচেতন পর্বান্তর ঘটে 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। কবিজীবনের প্রথম পর্বে তিরিশের কবিদের মতই কবির কবিতায় মূল বিষয় ছিল রোমান্টিকতা, নৈরাশ্য ও তার থেকে উত্তরণ। কলাকৈবল্যবাদী এই কাব্যবৈশিষ্ট্যের প্রকাশ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিরালোকে দিব্যরথ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। এরপর ক্রমাগত 'কবি দেশ-কাল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে ওঠেন। জীবন যখন বন্দী হয়ে যায়, তখন কবিকে তাকাতে হয় সমকালের দিকে, সমাজের দিকে। আসলে কবিই দায়বদ্ধ থাকেন সমাজ ও সংসারের কাছে। শামসুর রাহমানও ব্যতিক্রম নন। তাই একসময় 'জীবনের পাঠশালা' ছেড়ে পালানোর মন্ত্র যে কবির চেতনার অলিন্দে নাড়া দিয়ে যায়, সেই কবিই জীবনকে বন্দনা করে বলেন—

> "সবচেয়ে বড় কথা, সুদূর সৌরলোক, এই
> চরাচর, মানুষের মুখ, বাঁচার আনন্দ কিংবা
> যন্ত্রণা সব সময় বন্দনীয় মনে হয় আমার কাছে।"[২]

আসলে দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক মানুষ পরিণত হয়েছিল 'অদ্ভুত অন্ধকার'-এর

Scanned with CamScanner

বাসিন্দায়। 'বিপন্ন বিস্ময়'-এ আক্রান্ত আধুনিক মানুষের পরাবাস্তব চেতনাকে কবি শামসুর বাস্তবতার অভিঘাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত করতে চাইছেন। এক্ষেত্রে সেলিনা হোসেনের মন্তব্য শিরোধার্য—

> "বিশ্বজুড়ে খুব কম কবিই আছেন যিনি নিজের দেশ, তার ইতিহাস, ইতিহাসের কালচক্রে ব্যক্তি সম্পৃক্ততাকে এমন শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় গ্রন্থিত করতে পেরেছেন। তাঁর কবিতায় যেমন ইতিহাস আলোচিত হয়, মানুষের আবেগ রঙধনুর উদ্ভাসে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, তেমনি তাঁর কবিতা ইতিহাসের কবিগড়ায় দাঁড়িয়েও মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।"[৩]

একদিকে দেশ-কাল-ইতিহাস অন্যদিকে রঙধনুময় জীবনের হাতছানি— এই দুই-এর মধ্যে সাঁকো গড়ায় তৎপর হয়ে ওঠেন কবি। জীবনমুখী কবির জীবনলিপ্সার অন্যতম পাত্র হয়ে ওঠে প্রেম। কবির কাব্যজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রেমের ধারা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে প্রবহমান। কবির কাব্যজীবন শুরুই হয়েছিল 'অভিশপ্ত-যৌবনের ট্র্যাজিক-মহিমা নিয়ে।' তাই প্রথম দিককার কবিতায় কবি ভীরু প্রেমিক—

> "...জানি এ বয়সে প্রাণ খুলে
> হাসাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ঘরে শত্রু নিয়ে
> হাসির গোলাপ কুঁড়ি ফোটানো কঠিন।"[৪]

এ কবিই আবার ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে ফোটাতে চান 'সূর্যমুখী', 'সময়ের পাঁকে' দাঁড়িয়ে কবির উপলব্ধি জীবন মানে 'খুকির নতুন ফ্রকে নক্সা তোলা।' জীবন মানে 'বিবর্ণ গোলাপের' শুকনো কাঁটার আঁচড় নয়, ফুটন্ত গোলাপের অঙ্গীকার। কবি তাই ঘোষণা করেন—

> "ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা এবার আমি গোলাপ নেবো।"[৫]

শুধু গোলাপ নয় রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা সমেত প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কবি কখনো কখনো উচ্চারণ করেন—

> "যদি পাপ তোমার শরীর হ'য়ে নত হয়ে, হয় উন্মোচিত,
> দ্বিধাহীনতাকে খাবো চুমো, গাঢ়,
> বাঁধবো ব্যাকুল আলিঙ্গনে।"[৬]

সমালোচকের ভাষায়— "তরুণ শামসুর রাহমান ভীরু প্রেমিক, বয়স্ক শামসুর রাহমান দয়িতা দেহলিপ্সু।"[৭]

এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় কবিতা 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের 'আমার ভালোবাসা' কবিতাটি। সেখানে কবি 'ভীরু প্রেমিক' নন আবার 'দয়িতা দেহলিপ্সু'ও নন। কবিপ্রেম দেহ-মনের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশ্বপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সমকালকে কবিতা শরীরে বহন করেও, কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভালোবাসার তীব্র দহনজ্বালায় বিদ্ধ হয়েও, কবিতা কীভাবে বসন্তের গান গাওয়ার আকাশ খুঁজে পায় তারই-ক্যানভাস 'আমার ভালোবাসা'।

কবিতা ও কাব্যনামের দিকে তাকালে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় কাব্যনাম 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', কবিতা নাম 'আমার ভালোবাসা'। কাব্যনাম ও কবিতা নামের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুই নামের মাঝে সখ্যতা স্থাপন কি আদৌ সম্ভব কবির পক্ষে? 'দুঃসময়ের মুখোমুখি'

Scanned with CamScanner

দাঁড়িয়ে কবি কীভাবে উচ্চারণ করেন 'আমার ভালোবাসা' শব্দটি? কৌতূহলী পাঠকমাত্রেই এ প্রশ্নে আসবে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের তরুণ কবি শামসুর রাহমান, এ নামটির পাশে মুক্তিযোদ্ধা বা বীরযোদ্ধা এজাতীয় কোনো তক্‌মা কখনো দেওয়া যায় না। একাত্তরের নয়মাসব্যাপী বাংলাদেশে তৈরি হওয়া 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প' থেকে বন্দী জীবনের মাঝে কবি মুক্তিযুদ্ধ না করেও করেছেন অসীম যুদ্ধ। আসলে একজন কবির কলমের জোর একজন মুক্তিযোদ্ধার মনের জোর অপেক্ষা কোন অর্থেই ছোট নয়। কবির কলমের কালি মুক্তিযোদ্ধার রক্তের চেয়েও পবিত্র এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন কবি। কারণ অসির চেয়ে মসী কোন অর্থেই ছোট নয়। সেই মসীর জোরেই কবি বাংলাদেশের 'পোড়াজমি'তে লিখতে বসেছিলেন ভালোবাসার পাণ্ডুলিপি। আসলে কবির কাছে কবিতার সংজ্ঞাটাই আলাদা। কবিতা নিয়ে কবি বলছেন— "আমি মনে করি হৃদয়ের এবং মস্তিষ্কের, বুদ্ধি এবং আবেগ এবং অনুভূতির মিশ্রণে যে বস্তুটি তৈরি হয় এবং যার যার কাব্যভাষায় সেটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় তাকেই কবিতা বলে।[৮]

একদিকে হৃদয় আর একদিকে মস্তিষ্ক, একদিকে বুদ্ধি এবং অন্যদিকে আবেগের সংগ্রামে তৈরি কবিতা 'আমার ভালোবাসা।'

'আমার ভালাবাসা' কবিতাটি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখি কবি প্রথমেই বলছেন নৈরাশ্যের কথা কিন্তু তার জন্য ভেঙে পড়া নয়, আসছে ভালোবাসারই কথা। আসলে 'অ্যানিমার প্রতারণা' কবির কাছে নতুন নয়। এ কাব্যের নাম কবিতাতেও প্রতারণার কথা—

> "আমার অ্যানিমা স্বপ্নে সুদর্শনার হয়ে
> আমাকে অনেক কাছে ডাকে মত্ত নদীর ওপারে। আমি তার
> সান্নিধ্যের লোভে
> অকস্মাৎ পেঁচা হয়ে উড়ে যাই।"[৯]

কবি-হৃদয় লক্ষ তারাময় রক্তের দোলায় আন্দোলিত হয় অথচ ঝড় ওঠে ভালোবাসারই, কবি সাক্ষী রাখেন 'ঘরের চৌকাঠ'কে অথচ প্রেম ঘরের চৌকাঠ অতিক্রম করে পৌঁছে যায় জীবনের অন্ধকার কোণে : 'কালো কারাগারের দেওয়াল ফুঁড়ে ভালোবাসার সূর্যমুখী' ফোটানোর তাগিদ নিয়ে। স্বাধীনতা ও আন্দোলন ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকালীন বাংলাদেশে কবিতা কেবলমাত্র আত্মবিলাসের হাতিয়ার নয়, নিজ ব্যর্থতায় হাহাকার নয়, কবিতা হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের অনুভূতির আর ফসল।

সমালোচকের মতে—

> "কবিতা কোন নির্জন দুর্গবাসী কবির একান্ত বিলাস নয়, কবিতা সকলের। কবিতা গণ-মানুষকে কাছে টানবে কেন। বাণিজ্যিক কৌশলে নয়, টানবে নিজের ঔজ্জ্বল্যে, নিজের লাবণ্যে।"[১০]

শামসুর রাহমানের কবিতার দিকে তাকালে সেখানে 'গণমানুষ'-কে কাছে টানার একটা বোধ স্বভাবতই লক্ষ্য করা যায়। যে বোধ জন্ম নেয় সমকাল ও সমাজের ওঠা-পড়া, টানা-পোড়েনের দ্বন্দ্বে। 'আমার ভালোবাসা' কবিচিত্তে তার ব্যতিক্রম নয়। যেখানে কবি কোন এক নির্জন দুর্গের অধিবাসী হয়েও নিজকালকে অস্বীকার করতে পারেননি। কবি যতই

Scanned with CamScanner

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল পরিবেশে আতঙ্কবোধ করে নিজেকে নির্বাসন দিন না কেন স্বাধীনতা যুদ্ধের 'লক্ষ তারাময় রক্তের দোলায়' আন্দোলিত হয় কবিমনও। তবে যে মাটিতে রক্তের দাগ লেগে থাকে, যে সূর্য তাকে শোষণ করে সেই মাটির সেই সূর্যেরই আলোতে প্রস্ফুটিত হয় ভালোবাসার ফুল। তাই কবির কবিতা কেবলমাত্র কালীদহে নিজের কঙ্কালমূর্তির প্রতিবিম্ব দেখেই ক্লান্ত হয়ে যায় না। কবিও ভালোবাসার জোরে জীবনের স্বরলিপি রচনা করতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। তাইতো কবি বলেন—

> "ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে হাজার পিদিম জ্বালিয়ে বলছি এই সময়ের পাঁকে
> ফুটুক আমায় ভালোবাসা ফুটুক কালো কারাগারের দেওয়াল ফুঁড়ে।"[১১]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে মার্চের অভিশপ্ত রাতের কালো হাত থেকে রক্ষা পেলেও কবির অবচেতন মন বারবার পাকবাহিনীর দুঃশাসনকে চেতনার স্তরে পৌঁছে দিতে থাকে। বসন্তের কাঁধে সারি পেতেছে মেশিনগান। তাদের লাল সিগন্যালের বুকে ভালোবাসার পরশপাথরের স্পর্শ দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন কবি।

'কবিতা প্রতিমাসে' পত্রিকায় কবি শঙ্খ ঘোষ শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রেম নিয়ে বলছেন— "...শপথ করে যখন প্রেমের কথা বলেন এই কবি, তখন দেশকাল সব কিছুতেই ছড়িয়ে পড়ে কবিতা।"[১২]

একথা সর্বাংশেই সত্য যে কবি যখন 'শপথ' নিয়ে প্রেমের কথা উচ্চারণ করেন তখন প্রেম কেবলমাত্র 'কোন এক মানুষীর তরে কোন এক মানুষের প্রেম'-এ সীমাবদ্ধ থাকে না। 'সময়ের পাঁকে' দাঁড়িয়ে 'আমার ভালোবাসা' একথা উচ্চারণ করলেও এই 'আমি' ব্যক্তিচেতনা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যায় বিশ্বচেতনায়। 'আমি' কেবলমাত্র একক কোন মানুষ নয়, বিভাজনের কাঁটাতার, ক্যালেন্ডারের সাল-তারিখ পেরিয়ে আমি হয়ে ওঠে একটি জাতির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিকতার অভিযাত্রী। হুমায়ুন-আজাদ তাই যথার্থই বলেন—

"তাঁর আত্মনির্দেশক সর্বনাম 'আমি'র প্রাণকেন্দ্রে অবশ্যই বাস করেন কবি নিজে। কিন্তু তা কবিকে অতিক্রম করে নির্দেশ করে একজন আদর্শ সমকালবাসীকে। যে উৎসাহী তার কালের মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতা ও আবেগ নিজের মধ্যে ধারণ করতে। এমন না হলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠত একান্ত আত্মতান্ত্রিক, নিরন্ধ্র; কিন্তু শামসুর রাহমানের আমির সমস্ত দরোজা খোলা।"[১৩]

কবির এই আমিত্বের প্রকাশ পাওয়া যায় এমন কয়েকটি স্মরণীয় কবিতা হল— 'কেউ কি এখন', 'হোমারের স্বপ্নময় হাত', 'আমার অভিযোগের তর্জনী', 'স্যামসন', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' প্রভৃতি। লক্ষণীয় প্রতিটি কবিতাতেই ক্ষুদ্র আমি কোন এক অসীমতায় নিজেকে বিলিয়ে দেয় অজান্তেই। এ কবিতাতেও তাই কবি যদিও বারবার 'আমি বলছি', 'আমার ভালোবাসা' এজাতীয় শব্দবন্ধ উচ্চারণ করছেন তাও এই আমি বিশ্বনাগরিকেরই প্রতিনিধি হয়ে ধরা দেয় পাঠকমনে।

'আমার ভালোবাসা' কবিতায় লক্ষণীয় আরেক বিষয় হল— কয়েকটি শব্দ চলচ্চিত্রের মন্তাজের মতো কবিতায় বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। 'আমি বলছি', 'আমার ভালোবাসা', 'ফুটুক', 'গান গায়' এই শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি কবিতাকে অনন্য এক মাত্রা এনে দেয়।

Scanned with CamScanner

দাঁড়ি-কমা বিহীন বাধামুক্ত স্রোতের গতিতে এগিয়ে চলে কবিতা। অন্ধকারে বা নৈরাশ্যকে অস্বীকার করতেই যেন কবি বারবার জোর গলায় শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'; এ কবিতায় কবি যেন সেকথাকেই ঘুরিয়ে বলতে চাইছেন বসন্ত আসুক বা না আসুক ফুল ফুটবেই। আর স্বাভাবিকভাবেই প্রস্ফুটন নিয়ে আসবে বসন্ত। সবুজ পাতা সজীব হয়ে নবজাতকের মতো ফুটবে। তাই কবি কবিতার শরীরের খাঁজে খাঁজে জীবনের কালো দিকটি প্রকটিত করেও এতটুকু বেদনার্ত নন। কবি 'হাসপাতালের নিঃশব্দ ছাদ', 'কবরের কাঁচা মাটি'কে অস্বীকার না করেও জীবনের প্রতি অটল বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন—

"...আমার
সূর্যমুখী ভালোবাসা
নবজাতকের মতো
চীৎকার করে
অম্লান ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক
আমার ভালোবাসা সবুজ পাতার মতো গান গায় গান গায় গান গায় ।"[১৪]

কবির ভালোবাসা কেবলমাত্র সমকালবাসীর জন্য নয়, তা নবজাতকের মাধ্যমে উত্তরকালকেও খোঁজে। পরবর্তী প্রজন্মকে ভালোবাসার দিশা খোঁজার ঠিকানাও কবি দিয়ে যান। তাই তাঁর প্রতিটি কবিতাই হয়ে ওঠে স্মরণীয় মাইলস্টোন।

কবি শামসুর রাহমানের কবিতার অর্ধেক আকাশ প্রেম আর অর্ধেক আকাশ দেশ। এই আকাশের ঠিকানা যখন মাটিতে নেমে আসে তা কখনো কবিতাকে উপহার দেয় ভালোবাসার বীজমন্ত্র, কখনো বিশ্বমানবের অভিযাত্রী একক কোন মানুষ ক্রমাগত 'কলমযুদ্ধ' চালিয়ে যায় কবিতার মাটিতে, কখনো বা রক্তাক্ত মাটিতে হাজার লাশের রক্তে রাঙা হয়েও কবিতা গান গায় 'সবুজ পাতার মতো।' আর এসবেরই মেলবন্ধন হয়ে ওঠে 'আমার ভালোবাসা' কবিতাটি।

Scanned with CamScanner

অবনী বাড়ি আছো : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১. 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় কবিতা। কবিতাটি "ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি সাংকেতিক কবিতা। কেউ কেউ এ কবিতায় ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের 'The Listeners'-এর ছোঁয়া খুঁজে পান। যেহেতু 'অবনী বাড়ি আছো?' কবিতাটিতে এক আগন্তুকের কথা আছে, এবং আগন্তকের মুখে প্রশ্ন—'কেউ কি এখানে আছে?' এই 'অবনী বাড়ি আছো'-র মধ্যে কেউ কি এখানে আছে?'-র এক আপাত মিল বা সাদৃশ্য যাই বলি না কেন তাঁরা খুঁজে পান। তাই নির্দ্বিধায় তাঁরা রায় দিয়ে দেন—'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটি ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের 'The Listeners' কবিতাটির ছায়ায় লিখিত। এ ব্যাপারে কতটা সত্যাসত্য আছে আমি জানি না। তবে এই কবিতাটির মধ্যে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে যুগ-সচেতনসম্পন্ন কবিরূপে আমরা পাই। 'আগন্তুক' প্রতীকের মধ্যেই রয়েছে তার ইঙ্গিত।

মনে রাখতে হবে, আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে কবি হতাশ। তাদের একমাত্রিক জীবনের জন্য কবি স্বাভাবিক কারণে তাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। তাদের জীবনগুলো কেমন যেন বধির। ব্যক্তিস্বার্থ তাদের জীবনের গণ্ডি কেমন যেন ছোটো করে দিয়েছে। উন্মুক্ত জগতের দিকে তাদের তাকাবার ফুরসৎ নেই। এক কৃত্রিম যন্ত্রচালিত জীবন যেন তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। ছকবন্দি রুটিন মাফিক জীবন তাদের। মধ্যবিত্তের সামান্য সাজানো-গোছানো জীবনের মধ্যেই থাকতে তারা অভ্যস্ত। কোনো সাতেপাঁচে থাকতে চান না। সব সমস্যা এড়িয়ে চলাই যেন তাদের ধর্ম। তারা সময়ের কোনো আঁচই গায়ে মাখতে চান না। এসব ব্যাপারগুলো সম্ভবত কবি শক্তিকে বড়ো বেশি ভাবিত করেছিল বলে আমার বিশ্বাস। তিনি যেহেতু জীবনপ্রেমিক কবি ছিলেন, তাই এগুলোকে তাঁর কেন জানি মনে হয়েছিল—নিষ্ফল, অর্থহীন। তাই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতাটির শুরুতে যখন আমাদের একথা বলেন—

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, কবি 'দুয়ার এঁটে' কথাটির মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষদের সময়ের সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে চলার প্রবণতার কথাকে এখানে ব্যক্ত করেছেন। 'ঘুমিয়ে আছে পাড়া' কথাগুলির মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের স্থবিরতার কথাই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। বহির্জগতের কোনো আঁচই যাতে তাদের দেহ-মনে স্পর্শ করতে না পারে—তার জন্যই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের এই দুয়ার এঁটে ঘুম। 'কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া' এই শব্দ ক-টির মধ্য দিয়ে কবি তাঁর মানবিক-সত্তা জাগরণের

Scanned with CamScanner

কথাই ব্যক্ত করেছেন। বহির্জগতের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে এড়িয়ে সবাই দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে পড়লেও—কবি কিছুতেই ঘুমতে পারছেন না। তাঁকে জেগে থাকতে হয়। এই জাগাটা আসলে কবির এক মানবিকবোধের জন্য। সবাই বহির্জগতের পারিপার্শ্বিকতা থেকে দূরে থাকতে চাইলেও—কবি কিন্তু তা পারেন না। সমাজসচেতনতা বোধই তাকে থাকতে দেয় না। তাই ঘুমন্ত পুরীতে কবি একা জেগে থাকেন। জাগরণের মধ্য দিয়ে তিনি শুনতে পান রাত্রির ডাক—'অবনী বাড়ি আছো?' এ রাত্রির ডাক কিন্তু সময়ের, বহির্জগতের পারিপার্শ্বিকতার।

এখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই অবনী কে? অবনী মানে তো পৃথিবী। কবিতাটির রহস্য এখানেই। এখানেই রয়েছে কবিতাটির মূল চাবিকাঠি। এই রহস্যময়তাই কবিতাটিকে দিয়েছে একটা আলাদা সৌন্দর্য। আমার কিন্তু কেন জানি মনে হয়, এ অবনী আর কেউ নয়—কবি নিজেই। বরং এভাবে বলা ভালো অবনী হলেন কবির অন্তরাত্মা, যে প্রতিনিয়ত কবিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, এই অবনীই কবির ভেতরের পুরুষটাকে জাগিয়ে তুলে দূর করে দিতে পারে পৃথিবীর সময়-সংকটের যা কিছু অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর, অশুভ সেসব চিহ্নগুলিকে। এ কারণেই ঘুমন্তপুরীতে কেবল অন্তরাত্মাই জেগে বসে থাকে। এভাবেও বলা যায়—কবিই যেন কেবল এ অন্তরাত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকেন। সেই রাত্রের আহ্বান কেবল তিনিই একমাত্র শুনতে পান। এ আহ্বান বহির্জগতের!

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে কবি এক বর্ষণের চিত্র অঙ্কন করে নিসর্গের অপরূপ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলেন। কবি-কথাতেই যা ফুটে উঠেছে—

> বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
> এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
> পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
> দুয়ার চেপে ধরে—

বারোমাস বৃষ্টি পড়ার মধ্যে আমাদের চোখের সামনে যে চিত্রটি স্পষ্ট উঠে আসে তা হল পাহাড়ি এলাকার পাহাড়ে গায়ে গায়ে মেঘ ঘুরে বেড়ায়। কবির মেঘকে গাভীর সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে রয়েছে কবির অনুপম এক সৌন্দর্যবোধ। 'গাভীর' প্রতীকী ব্যঞ্জনা এনে মেঘের অনুপম সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্তভাবে রসসমৃদ্ধ করেছেন বলা যেতে পারে। গাভীরা সাধারণত চরে বেড়ায় ঘাসের প্রত্যাশায়। ঘাসের কথা এনে কবি আসলে এখানে আমাদের সামনে এক প্রতিকূল অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। 'পরাঙ্মুখ' অর্থাৎ প্রতিকূল সে ঘাস যেন কবির বন্ধ গৃহের দরজা চেপে ধরে। এই দুয়ার চেপে ধরার মধ্যে এক দুর্যোগের কথাই চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। 'ঘাস' এখানে প্রতীকী মাত্র। বাইরের দুর্যোগ, অর্থাৎ বহির্জগতের পারিপার্শ্বিকতার আহ্বান কবি যেন উপেক্ষা করতে পারেন না। সে ডাক—শুভ না, অশুভ কবি মানতে চানও না যা সমাজসচেতন কবির চৈতন্যসত্তাকে জাগিয়ে তোলে।

আবার তৃতীয় স্তবকে কবি যখন বলেন আমাদের একথা—

> আধেক লীন হৃদয়ে দূরগামী

Scanned with CamScanner

ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো'?

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না—কবি ঘোর বর্তমানকে আমাদের সামনে নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি' এ কথার মধ্যে যা প্রস্ফুটিত হয়েছে। ব্যথা—কীসের ব্যথা? এ ব্যথা হল কবি-মনের। বর্তমানে একমাত্রিক স্বার্থপরতার! যা কবি-মনকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করছে, রক্তাক্ত করে তুলেছে। এভাবেই কবি চলমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বর্তমানের চিত্র আমদের সামনে তুলে ধরে তাঁর কবি-মনের ভেতরের বেদনার নীরব এক অনুচ্চারিত দীর্ঘশ্বাস আমাদের কাছে তুলে ধরেন 'আধেকালীন হৃদয়ে দূরগামী' এক কথার মাধ্যমে। তবু কবি যেহেতু জীবনপ্রেমিক, সত্য ও সুন্দরের পূজারি তাই হৃদয়ের ব্যথা-ক্ষতকে সঙ্গী করে ঘুমিয়ে থাকতে চান না। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের কাছে পা বাড়াতে চান। তাই তিনি ফের রাতে কড়া নাড়ার শব্দ অনুভব করেন। এই কড়া নাড়ার শব্দেই রয়েছে সে ডাক। 'সহসা' শব্দটি যেন রাত্রির আহ্বানকে অর্থপূর্ণ করেছে। 'সহসা' শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দ্বান্দ্বিক চেতনার কবি-অন্তরের এক সুপ্তবোধ। যে বোধ তাঁর ঘুম কেড়ে নিয়ে রাতের আহ্বানে বহির্জগতের সঙ্গে মিলনের ডাক দেয়। কাজেই, এই 'অবনী বাড়ি আছো?' কবিতাটিকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমাজসচেতনতা বোধের এক আত্ম-উন্মেষের কবিতারূপে আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। কেননা, এই কবিতাটিতে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়-জাগরণের কথাই ব্যক্ত করেছেন বলে আমার মনে হয়।

Scanned with CamScanner

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে : জয় গোস্বামী

"কিন্তু দুর্গতিনাশিনী
এবার শেষ কথা শুনে নাও
আমরা এই ছাগ জন্মে
নিজেকে বলি দিতে আসিনি" ('রক্তবীজ', ভুতুম ভগবান)

এই বলি না দেওয়ার কঠিন পণ বুকে নিয়ে উত্তর-জীবনানন্দ পর্বের অন্যতম জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামী এগিয়ে চলেছেন 'ভুতুম ভগবান'-এর যাত্রাপথে। এই পথে চলতে চলতে জীবনকে যত্ন করে কবিতার মধ্যে তুলে রেখেছেন কবি। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার জীবন্ত শিল্পরূপই হল তাঁর কবিতা। তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মারা যান শৈশবে। মা ছিলেন স্কুল মাস্টার। মায়ের কর্মসূত্রে রাণাঘাটে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। দারিদ্র্যের সঙ্গে সারাজীবন আপোষহীন সংগ্রাম করতে করতে দীন, দরিদ্র মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই-এ সামিল হয়েছেন তিনি। তাই শূন্য হাতে বিদায় না নিয়ে এক সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখেন কবি। তাঁর বহু পঠিত কাব্যগ্রন্থ 'ভুতুম ভগবান' (১৯৮৮ খ্রিঃ)-এর 'রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে' কবিতায় এই স্বপ্ন এবং স্বপ্ন পূরণের অনুরণন শোনা যায়।

জয় গোস্বামীর 'রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে' কবিতাটি পর্যালোচনার পূর্বে আমরা যারা কবিতা পড়তে ভালোবাসি, আমরা যারা গান শুনতে ভালোবাসি তারা একটু সচেতনভাবে খেয়াল করলে দেখতে পাবো, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের 'রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে' বাক্যটি যেন ধ্রুবপদের মতো বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। কবিগুরু শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে দেখাতে চেয়েছেন দীন মানুষের জীবনে রাত্রের স্বপ্ন-বেশে সুখ চকিতে ধরা দেয় তারপরে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। তখন দরিদ্র কাঙাল মানুষকে শূন্য হাতেই পড়ে থাকতে হয়। এই দীন মানুষ সৃষ্টিহীন কবিও হতে পারে, যাঁর কাছে সৃষ্টিসুখ ক্ষণিকের তরে দেখা দিয়ে চলে যায়। তারপর সেই সৃষ্টিহীন কবি-হৃদয়কে গ্রাস করে গভীর শূন্যতা—

"নির্ণিমেষে দেয় সে দেখা
নিশীথ রাতে স্বপন বেশে
রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে।"

রবীন্দ্রনাথ যেখানেই শেষ করলেন কবি জয় গোস্বামী যেন সেখানেই কলম ধরলেন। নিশীথ রাতে যে স্বপ্ন-সুখ এক নিমেষে নিঃস্ব মানুষের হৃদয়ে আসা প্রজ্জ্বলন করে চলে যায় তাকে কবি বাস্তবায়িত করতে বদ্ধ পরিকর।

'কাঙাল' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল 'দীন', 'দরিদ্র' বা 'নিঃস্ব'। সংসারে বঞ্চিত দুর্বল উৎপীড়িত মানহারা মানব হল কাঙাল। যাদের দুঃখের মোড়কে ঘেরা সুখের ছোট্টস্বপ্ন কোনোদিনই সত্যি হয় না। জয় গোস্বামীর এক যুগ আগের মানব দরদী কথাসাহিত্যিক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে এইরকম এক কাঙাল মায়ের ছোট্ট স্বপ্নকে ভেঙে খান খান হয়ে যেতে দেখি। যেখানে কাঙালকে তাঁর মৃত মা অভাগীর মুখে আগুন দেওয়ার এক টুকরো কাঠের জন্য এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয়। শত লাঞ্ছনা, অপমান ও অত্যাচার সহ্য করেও মায়ের মুখের আগুনের জন্য এক টুকরো কাঠ সে সংগ্রহ করতে পারেনি। এই দীন মানুষের ভাঙা স্বপ্নকে গড়তে, পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন কবি জয় গোস্বামী। তাই তিনি খানিক অধিকারবোধে উচ্চারণ করেন—

"এসেছি যখন খালি হাতে ফিরবো না।"

বহু আলোচিত 'ভুতুম ভগবান' কাব্যগ্রন্থের 'রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে' কবিতাটি তিনটি স্তবকে ষোলোটি পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত। প্রথম দুটি স্তবকে চারটি করে আটটি পঙ্‌ক্তি এবং শেষ স্তবকে আটটি পঙ্‌ক্তি। মোট এই ষোলটি পঙ্‌ক্তিতে কবি সংসারে যারা বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কোনোদিন হিসাব নেয়নি সেই মান-হারা কাঙাল মানুষের অধিকারকে দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রূপ দিতে চেয়েছেন এক সুন্দর সমাজব্যবস্থার। যা করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত কবি নিজেই কাঙাল হয়ে উঠেছেন, এবং তাতেই তিনি গর্বিত—

"আমার সঙ্গে আমিই থাকবো ওগো অন্তর্যামী।"

প্রথম স্তবকে কবি ব্যক্ত করেন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা বাসনাকে। পৃথিবীতে যখন তিনি এসেছেন, তখন শূন্য হাতে ফিরবেন না। তিনি এই দেশ ও দশের জন্য কিছু করে যেতে চান। এ যেন কবি সুকান্তের বলা কথা—

"এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।"

তাই তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছেন তাকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। আসলে এই যা কিছুই হল জীবন-অভিজ্ঞতা, যা দিয়ে একদিকে যেমন সৃষ্টিহীন কবিমন সৃষ্টির নেশায় মত্ত হতে চেয়েছেন তেমনি অপর দিকে দুঃখী মানুষের ভেঙে যাওয়া বাসাকে বাঁধার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তিনি ভোগী স্বার্থপর মানুষের মতো একাকী ভোগের বাসনাকে দূরে ফেলে যা কিছু পেয়েছেন তা ভাইবোনের মধ্যে ভাগ করে দিতে চান—

"একাই নেবো না, ভাইকেও দেবো, ভাই দেবে তার বোনকে
দিয়েছি যখন ফিরিয়ে নেবো না মনকে।"

আমরা যারা সচেতন পাঠক তারা 'ফিরিয়ে নেবো না মনকে' কথাটির দিকে যদি ভালো করে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, এখানে মানব প্রেমিক জয় গোস্বামীর নিঃস্বার্থ মানব প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রেম যেন আমাদের পরম-পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

"ভিক্ষুকের কিবা বলো সুখ/ কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল
দাও দাও আর ফিরে নাহি চাও/ থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

এই স্বার্থহীন প্রেমকে সম্বল করে কবি এগিয়ে চলেছেন আরো সামনের দিকে। যেখানে দ্বিতীয় স্তবকে দেখা যায় এক স্বামী ছেড়ে যাওয়া মেয়ের জীবনে নেমে আসা আসন্ন মৃত্যুর মুখে ধূলি ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটিকে নিজের অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতে চাইছেন। তাকে দিতে চেয়েছেন এক শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রয়—

"এসেছি যখন, ফিরবো না খালি হাতে
ধুলো ছুঁড়ে দেবো মৃত্যুর গায়ে, স্বামী-ছেড়ে-যাওয়া মেয়েটির পায়ে
ও চলে আসুক আমাদের কাছে, আমি আর ভাই বেঁধে দেবো ওর ঘর।"

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর জীবনে পতিই যখন একমাত্র গতি তখন স্বামীহীন স্ত্রীর জীবন ছেঁড়া তারের মতো। অসহায় স্ত্রী-মানুষকে এক টুকরো বাঁচার ঠিকানা দিতে কবি এগিয়ে আসেন। কবি কোথাও যেন অনুভব করেন তাঁর একার দ্বারা হয়তো এই অসঙ্গতিমূলক সমাজব্যবস্থার বুকে পা রেখে এ বৃহৎ দায়ভার বহন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাই তিনি ভাইকেও সঙ্গে নেন—

"এসেছে যখন আমরা দুজন, দুজনেই ওর বর।"

কবি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাঁচতে ও বাঁচাতে চাইছেন। এখানে কোথাও শঙ্খ ঘোষের মতো তিনি বলতে চান 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।'

তৃতীয় স্তবকে এসে কবি একক অনুভূতি নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতির রূপ লাভ করেন। কবি যেন ব্যক্তি-আমি থেকে বিশ্ব-আমির দিকে যাত্রা করতে শুরু করেন। প্রথম দুটি স্তবকে কবিকে বলতে শুনি যথাক্রমে—'এসেছি যখন খালি হাতে ফিরবো না', এবং 'এসেছি যখন ফিরবো না খালি হাতে'। এখানে কবি নিজেই খালি হাতে ফিরতে চাইছেন না। কিন্তু শেষ স্তবকে এসে কবি কাউকেই খালি হাতে ফেরাতে চান না—'পেয়েছি যখন ফেরাবো না হাত খালি'। সমাজ সচেতন কবি সমাজ নামক বাগানের বুকে পরিচর্যার জন্য দিয়ে যেতে চান শুভ চেতনাকে, যা অতন্দ্রপ্রহরীর মতো সমাজকে কলুষ মুক্ত করবে—

"পেয়েছি যখন ফেরাবো না হাত খালি
বাগানকে দেবো সুন্দরমতো মালী।"

কবি তাঁর শুভ চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া ঘরে নেশায় আচ্ছন্ন মানুষদের নিয়ে এসে প্রকৃত পথের ঠিকানা দিতে চেয়েছেন—

"দিনরাত্তির নেশা ক'রে ক'রে যত ছেলেপুলে রাস্তায় ঘোরে
সব ধ'রে ধ'রে বাড়িতে তুলবো, বাড়ি হয়ে যাক খোলা মাঠ আর
মাঠ ঘিরে দিক বন।"

এই ভাঙাচোরা মানুষদের নিয়েই তাঁর সংসার। যারা পথ চলতে ভয় পায় তাদেরকে এক সুতোয় বেঁধে তিনি পথ চলতে চাইছেন। প্রতিটি মুহূর্তে অভূতপূর্বভাবে ঘুরে বেড়াতে চাইছেন এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে—

"বনে জঙ্গলে আমরা ঘুরবো, প্রতিমুহূর্তে অভূতপূর্ব, আমরা ঘুরবো
আমরা আমরা আমি আমি আমি আমি।"

প্রসঙ্গক্রমে মনে আসে 'সাগর থেকে ফেরা'র কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা—

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র এই সাধারণ কামার ছুতোরের মাঝখানে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাসহীন কাঙাল মানুষের বুকে আত্মপ্রত্যয়ের বীজ বপন করতে কবি জয় গোস্বামী

Scanned with CamScanner

হয়ে উঠেছেন কাঙালদেরই একজন। আর এখানেই তার অহং আর তার মুক্তি—

"আমার সঙ্গে আমিই থাকবো ওগো অন্তর্যামী।"

তিনি সীমার মধ্যে অসীমকে পেতে চেয়েছেন। এ মুক্তি বা শূন্যতা আসলে শূন্য নয়, যেন চরম পূর্ণতারই বাণীরূপ।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন: শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতার ইতিহাসের কাহিনীর পটভূমি কবির সমকালীন যুগের জীবন তথ্য আলোচনা কর।

অথবা

শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি বিশ্লেষণ কর এবং এই কবিতার সমকালীন জীবন সত্য কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা উদ্ঘাটন কর।

পঞ্চাশ দশকের অন্যতম প্রধান কবি পুরুষ শঙ্খ ঘোষ। সমাজ সচেতন এই কবি মানব এবং স্বদেশের সংকটকালে প্রতিবাদী ভূমিকায় বারবার অবতীর্ণ হয়েছেন। পঞ্চাশ দশকের অনেক কবি যখন স্বীকারোক্তিমূলক আত্মকথনে এবং নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যের নিরাপদ দুর্গে অবস্থান করেছেন এবং সমাজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, শঙ্খ ঘোষ তখন চারপাশের ভেঙে চোরা মানুষজনের মুখে আলো ফেলে দেখে নিচ্ছেন তাদের বেদনার্ত হৃদয়ের স্বপ্ন ভাঙন। ১৯৭৬ সালে 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭৪-৭৬। তিনি অবিচল শাণিত শুদ্ধ সত্যের সমর্থনে এবং মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে চেতনা বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। কাব্য এই কাব্যগ্রন্থে স্বদেশের ক্ষতস্থানগুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। কাব্য গ্রন্থের নাম কবিতা 'বাবরের প্রার্থনা' পড়ার সময় আমাদের মনে পড়ে যায় ষাট দশকের শেষ পর্ব থেকে সত্তর দশকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ভয়ংকর রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির কথা। ১৯৬৭ সালে দীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনের একটি পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব। বাংলা দেশের রাজনৈতিক কাঠামো তখন নড়বড়ে। চক্রান্তের মাধ্যমে অতি দক্ষিণ পন্থী সরকারের পতন ঘটে গেল। ইতিমধ্যে উত্তর বাংলার নকশালবাড়িতে সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দিল। সংসদীয় রাজনীতির দিকে মুখ ফেরাল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। সি.পি.আই. এম ভেঙে সি.পি.আই. এম.এল. এর উদ্ভব ঘটল। ১৯৬৪, ১৯৬৭, ১৯৬৯ সারা দেশে তখন গণ আন্দোলন। সেই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হল কত কিশোর। রাজনৈতিক নেতারা ও মন্ত্রীরা পুলিশের সহায়তায় গোষ্ঠী পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাসের আবহাওয়া বয়ে নিয়েছিল। কলকাতা তখন এক দুঃস্বপ্নের নগরী। ট্রামভাড়া ও শ্রমিক আন্দোলনের পীঠস্থান এই পশ্চিমবঙ্গের অগ্নিগর্ভ মাটির বুকে তখন অজস্র যুবকের মৃতদেহ পচে উঠবার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কার্জন পার্কে খুন হলেন সরোজ দত্ত। বারাসত, বসিরহাট, বরানগর, কসবা, তিলজলা প্রমুখ অঞ্চলে দেশভক্ত গণতান্ত্রিক পুলিশ বাহিনী ঠান্ডা মাথায় তরতাজা সব যুবকের প্রাণবায়ু তখন কেড়ে নিচ্ছে। এই ভয়ংকর ও নিঃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলেন এই বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। অথচ তাঁরাই আবার তৎপর হয় সোচ্চার নিন্দায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের নিপীড়নের

বিরুদ্ধে। হাজার হাজার বীর রাজ্যের সম্ভাবনাময় তরুণ বামপন্থীদের বিপুল সংখ্যায় খুন হওয়ার সময় এদেশের বুদ্ধিজীবিরা যেন চুপ থাকাকেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। এই সময়কালের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে মানবেন্দু রায় তাঁর 'মেঘের কাব্যকথা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> "... সত্তর দশকের শুরুর আগে থেকে ভারতবর্ষের হিংস্রতম মানুষের রক্তলোলুপ নিষ্ঠুর জীবন থেকে উৎসারিত মেধাবীর রক্তে প্রায় সমস্ত দেশকে প্লাবিত করেছিল। পশ্চিম বাংলা সেই অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি এবং সম্ভবত নকশাল বাড়ি। বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ শ্রীকাকুলাম গিরিখাতে পৌঁছতে খুব বেশি সময় নেয়নি। এই ছড়িয়ে যাওয়া আগুন শাসকদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিল।"

[প্রাকৃত বর্ণমালা ; পৃঃ-২২]

সন্ত্রস্ত হয়ে শাসকেরা শুধু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরই জন্ম দিলেন না, সেই সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করলেন পোষ্য বুদ্ধিজীবী এবং লুম্পেন রাজনৈতিক শিষ্যদের যারা সবসময় মদত দিয়েছে প্রশাসন যন্ত্রের নির্বিবাদ ক্ষমতাসীন কার্যকলাপকে। পূর্ববাংলায় বিদ্রোহীদের যখন 'মুক্তিযোদ্ধা', 'সংগ্রামী' বলে প্রচার চালানো হচ্ছে তখন এই বাংলার উঠোনে-রাস্তায়-মাঠে-ঘরে-লকআপে আমাদের সন্তান সন্ততিদের তখন আখ্যা দেওয়া হচ্ছে 'সমাজ বিরোধী' বলে। চল্লিশ দশকের অন্যতম প্রধান কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই রাজনৈতিক পাশাপাশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে লিখেছিলেন "বুদ্ধিমানের বিবেক" এমন স্মরণীয় প্রবন্ধটি। নকশাল হত্যা তার পরবর্তীতে যে রাজনৈতিক ধারা, সেই ধারাবাহিকতা সূত্র ধরে চিহ্নিত হতে শুরু করল। মানবেন্দু অবশ্য সাম্প্রতিকের উপর বসে শুধু যেমন আর সব কিছুর মতো, মানুষ হিসেবে চুপ করে থাকতে পারলেন না। ফলে বারবার প্রার্থনা কবিতাটিতে সেসময়কার নকশাল আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাস, যে ইতিহাসের সঙ্গে শুধু যে স্বয়ং মানবিক অভিজ্ঞতা সংযুক্ত। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটে দাঁড়িয়ে আমরা 'প্রার্থনা' কবিতাটিকে কোনভাবেই ভোলা যায় না। কবিতার মুহূর্ত নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি অসুস্থ শয্যাশায়ীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়েই তিনি কবিতাটি রচনা করেন। ব্যক্তিগত বেদনা বোধকে তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় সামাজিক বেদনাবোধে, সমগ্র মানবের বেদনাবোধে রূপান্তরিত করতে সফল হয়েছেন। তাছাড়া

Scanned with CamScanner

কবিতাটি পাঠের পর বোঝা যায় তিনি শুধু অসুস্থ কন্যাসন্তানের পিতা নন, সেই সঙ্গে একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ পিতাও। নকশাল আন্দোলনে নিহত অজস্র প্রাণবান যুবকের পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি যেন পুত্রশোকে আচ্ছন্ন হয়েছেন, তেমনই ভেঙে দিয়েছেন পিতৃত্বের সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধতা। কোনো পিতাই প্রত্যাশা করতে পারেন না, যেমন পুলিশ কিংবা পুত্রের ঘাতকদের শাসনের অধীন হতে হবে। সন্তানের সুখে থাক, সন্তানের মঙ্গল হোক — প্রত্যেক পিতাই দিবারাত্র সেই প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন। শঙ্খ ঘোষও মৃত্যুকবলিত ও সত্তর দশকের তরুণদের প্রেক্ষাপটে পিতা হিসাবে প্রার্থনায় রত। জল্লাদেরা যখন তাঁর সন্তানের গলাটিপে শ্বাসরোধী পরিবেশ তৈরি করেছে শঙ্খ ঘোষের পিতৃসত্তা তখন কান্নাভেজা তীব্র প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। পিতা হিসাবে তাঁর মনে হয়েছে, এই পাপের দায়ভার তাঁরও। যেমন রাতের পুঞ্জিত মেঘকে কাঁদায় যেভাবে 'আলো' তেমন রবীন্দ্র-নাথের মতো শঙ্খ ঘোষও একটা 'কালান্তর', ৩৭ সংখ্যক কবিতায় বলেছিলেন:

"ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি
মাথা কর নত
এ আমার এ তোমার পাপ।"

সত্তর দশকের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে শঙ্খ ঘোষও এইভাবে মানবিক-কবিতায় সমাজ পিতা স্বীকার করে নিয়ে, দায় থেকে আত্মদংশনে, দায় থেকে আত্মমননে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আর তাই 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি আত্মসত্তার যন্ত্রণার কবিতা। সময়ের রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত শক্তি মর্মর, আর্তমর্মর, অথচ ~~...~~ যন্ত্রণা ক্ষতের বিমূর্ত কবি আবেগে সোচ্চার কবিতাটি পরিবেশিত। ভৌগোলিক বিষয়ের প্রতীকী অবস্থান থেকে ক্রমে তিনি এই কবিতায় হয়ে উঠেছেন সমকালীন সাক্ষ্যের বিকীর্ণ ভাষ্যকার। সমকালীন কান্নার যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বাবর চরিত্রটিকে গ্রহণ করেছেন এবং বাবরের পিতৃত্ব জ্বালাময় অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন। বাবর ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ১৪৮৩ – ১৫৩০), তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জহিরউদ্দিন মহম্মদ। তুর্কী ভাষায় বাবর শব্দের অর্থ হল সিংহ বা বাঘ। তিনি ছিলেন সাহসী বীর এবং সুদক্ষ সেনানায়ক। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে শঙ্খ ঘোষ এত বছর বাদে বাবরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কেন? তার কারণ হিসাবে কয়টি সূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে:

ক. বাবর ছিলেন সংগীত ভক্ত এবং শিল্প রসিক। তাঁর আত্মচরিত তুর্কি সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। তুর্কী ও ফারসী ভাষায় তিনি সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। সুতরাং বলা যায়, একাধারে

Scanned with CamScanner

কবি শঙ্খ ঘোষ সেকালের পিতাদের মনোযন্ত্রণার সঙ্গে একীভূত হতে চেয়েছিলেন। বাবরের মানসিক যন্ত্রণা যে একালের পিতার মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে মিলে যায়, মিলে যেতে পারে — তা যেন স্পষ্ট হয়েছিল।

ঘ. বাবরের চোখের সামনে তাঁর সন্তান হুমায়ুন ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুমূর্ষু সন্তানের জন্য বাবর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে যান। তাঁর প্রার্থনায় পিতৃহৃদয়ের আকুলতা স্পষ্ট হয়। সেখানে সম্রাট হিসেবে নয়, একজন স্নেহময় পিতা হিসেবে বাবর চেয়েছিলেন পুত্র যেন মরণাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে নবযৌবনের নবজীবনের স্বাদ পুনরায় পায়। বাবরের মনে হয়েছিল, তিনি রণযুদ্ধের রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে যে পাপ করেছেন, তার কারণেই সন্তানের এহেন পরিণতি। ঈশ্বর বাবরকে এত ঐশ্বর্য দিয়েছেন অথচ তাঁর সন্তানের জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে — এই ভয়-ভাবনা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় বাবর ঈশ্বরের কাছে পুত্রের জীবনভিক্ষা প্রার্থনা করলেন এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে আত্মকৃত পাপবোধেই আচ্ছন্ন হলেন। শঙ্খ ঘোষ উপলব্ধি করেছেন মধ্যযুগ থেকে আর আধুনিক যুগ থেকে — সবযুগেই পিতৃহৃদয় অপরিবর্তনীয়। তাই আধুনিক যুগের কবি হয়েও উল্লিখিত শঙ্খ ঘোষ পিতৃহৃদয়ের ঘনীভূত যন্ত্রণা নিয়ে বাবরের পিতৃহৃদয় স্মরণ করেছেন।

বাবর চেয়েছিলেন শুধু হুমায়ুনকে বাঁচাতে। যাকে আমরা বলতে পারি ব্যক্তিগত প্রার্থনা। শঙ্খ ঘোষ চেয়েছেন নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত যুবকের বাঁচাতে। যাকে আমরা বলতে পারি সমষ্টিগত প্রার্থনা। ভারতচন্দ্র: 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে আমরা দেখেছি অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীকে বর দিতে চাইলে সে নিজের জন্য কিছু চায়নি। কেবল তার প্রার্থনা ছিল — "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে", বাবরের প্রার্থনা কবিতায় শঙ্খ ঘোষ এই প্রবাদ প্রতিম পংক্তিটিকে অনুসরণ করে নকশাল আন্দোলনের সমস্ত যুবকের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে লিখেছেন:
"আমার সন্ততি স্বপ্ন থাক।"

উল্লিখিত কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সঙ্গে তুলনা

Scanned with CamScanner

এবং পৃথিবীর নরকলীলা দর্শন করে পুনরায় আক্রোশে বলেছিলেন: -"আমার অন্তর এখন প্রস্তুত নয়।" তেমনভাবেই শঙ্খ ঘোষ 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ সমর্পিত প্রার্থনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। কবিতা যে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, বাবরের প্রার্থনা। কবিতাটি তার সর্বোচ্চ উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এক গুচ্ছ নির্বাচিত সাক্ষাৎকারে শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন:

> "...নানা সময়ে আমাদের নানা রকম ভাবী ভূমি তৈরি আমাদের কবিতার বিষয়ে। কবিতায় আমরা মানুষের সত্তম উত্তরণ শুনতে পাই। আমরা চাইব সেই অভিজ্ঞতার মুক্তি হোক বিস্তৃত, সে ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণীগত।"

[গদ্যসংগ্রহ খণ্ড ; আগষ্ট, ২০১১ পঞ্চম সংকলন]

'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় বাবর চরিত্রের মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশিত শঙ্খ ঘোষ এভাবেই বলেছেন শ্রেণীগত চেতনার দিকে। বাবরকে তিনি এই কবিতায় রূপকের মতো সাজিয়েছেন। আমরা এই ভাবে ভাবতে পারি:

বাবর = শঙ্খ ঘোষ (কবিসত্তা এবং পিতৃসত্তা)

হুমায়ুন = লাঞ্ছিত নকশাল যুবক।

ইতিহাসের চরিত্র বাবরকে গ্রহণ করে কবি শঙ্খ ঘোষ 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় কোনোরকম ঐতিহাসিক রস সৃজন করেননি এবং ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সমকালীন চেতনা ও সম এক বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করেছেন তিনি।

Scanned with CamScanner